ঋষিশিল্পে দশমহাবিদ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বিশ্বসৃষ্টির দশটি প্রধান মহত্তত্ত্বের তত্ত্বগুলি হইল এক একটি "মহাবিদ্যা"। দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যারূপিণী হইলেন "কালী"। ইনি অখণ্ড কালশক্তিরূপা। গুণাতীত শুদ্ধচৈতন্যঘন সত্তার (অর্থাৎ মহাকালরূপ শিবের) বক্ষে যে কালশক্তি নিত্যাবস্থায় নৃত্য করেন, তিনি কালী। কালরূপী ঈশ্বরী কালী অনির্ব্বচনীয় ত্রিগুণাত্বিকা শক্তিস্বরূপিনী আদিশক্তি। তাই দেবী কালিকা হইলেন—

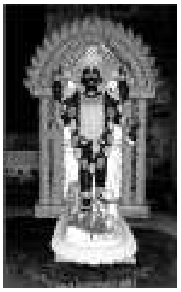

কালী

"কালী করাল বদনী শ্যামা, আদ্যা নিত্যা বিদ্যা বামা।
কালরূপিনী শিবভামিনী মহাশক্তিস্বরূপিনী উমা ॥
ঘোর বদনা মুক্তকেশী চতুর্ভূজা, জ্ঞানদা বরদা মোক্ষদা অভয়া
গলে মুণ্ডমালা, লোলজিহ্বা ভীষণা, সগুণারূপিনী সুজয়া ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র পূজে মা তোমায়, চন্দ্রতপন তব পদতলে লুটায়;
কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য্য জ্যোতির বিভায়, উদ্ভাসে তব চিন্ময়ীরূপ মহাপ্রভায়।
ধূর্জটি পরে সংস্থিতি তোমা, তুমি মা শিবের শিবানী উমা
মাতঙ্গিনী আনন্দস্বরূপা ভীমা, চিতিশক্তি চৈতন্যদাত্রী মনোরমা ॥"—

সুপ্রসিদ্ধ কালীসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কথায়—

কালী কালো কেন? —কালো বর্ণে সমস্ত বর্ণ লয়প্রাপ্ত হয়, মা হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে এবং কালে ইহা মায়ের শরীরেই লয় হইবে। এইজন্য কালী মা কালরূপা কালী। ঈশ্বরকে যদি নিরাকার পরব্রহ্ম এবং অবাঙ্‌মানসগোচর বলা যায় তাহা হইলে সাধারণ মানব নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদী হইয়া যাইবে। সে জন্য তিনি এক হইয়াও বহু, পুরুষ হইয়াও প্রকৃতি; মা সেই অদ্বিতীয় পুরুষের শক্তি; সেই অদ্বিতীয় পুরুষ ধ্যান ধারণার অতীত। সুতরাং তাঁহার শক্তিই আমাদের ধারণার বস্তু; মায়াযোগে তিনিই কালীরূপা। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তাঁহার এই চারিটি হাত। মা হইলেন ব্রহ্মের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি। তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কারিণী। কালে সমস্ত বস্তুই কালকামিনী কালীর দণ্ডে লয় পাইবে। এই জন্য মা হইলেন কালো। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ গ্রাস করেন বলিয়া কালী করাল বদনা। পাপীর পক্ষে ভয়ঙ্করা আর পুণ্যাত্মার পক্ষে অভয়দায়িণী। এইজন্যে মায়ের দক্ষিণহস্তদ্বয় ভক্তের জন্য আর বামহস্ত অসিমুণ্ড ধরা—পাপীর জন্য। মায়ের কেশজাল জগতের মায়াজাল। মায়া যেমন চির বিস্তৃত ও দোলায়মান, কেশজালও তদ্রূপ। মা হলেন দিগম্বরী; ইহা তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্বের পরিচয় প্রদান করে। মা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই ত্রিনয়ন দ্বারা জগৎকে অবলোকন করিতেছেন, এইজন্য তিনি ত্রিনয়না। মা লোলজিহ্বা কারণ জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হইলে শ্বাসের গতি সুষুম্নাগামী হয় এবং কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে। কবিরঞ্জনের ভাষায়—

"সদাশিব শবে আরোহিনী কামিনী।
শোভিত শোণিত ধারা মেঘে সৌদামিণী।
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছ শব,
মূর্তিমতী মনোভব ভবভামিনী ॥
রবিশশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী
পদনখে শশীরাশি গজগামিনী।"—

চৈতন্যভূমিতে প্রাথমিক স্পন্দনের পূর্বাবস্থাই হইল মায়ের "আদি" অবস্থা। তাই কালীরূপা আদ্যাশক্তির স্বরূপকে "আদ্যা মা" বলা হয়। প্রণবের স্পন্দিত আভাসই হইল কাল বা সময়। কাল বর্দ্ধিত হয় এবং সংকুচিত হয় বিষ্ণুনাভি স্থিত ঘূর্ণায়মান মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিচ্ছুরিত তরঙ্গের স্পন্দনের ফলে। কালীতত্ত্বে খণ্ডকাল ও অখণ্ডকালের মহাসম্মেলন হইয়াছে। তাই মহান কালীসাধক কমলাকান্তের ভাষায় কালী হইলেন, "আদিভূতা সনাতনী শূণ্যরূপা শশীভালি।" এই কালরূপী কালী অনন্ত, অসীম। অন্ধকার কক্ষে যেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না তেমনি কালীর গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা কেহই দেখিতে পায় না। তাই কালীর বর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বা কালো। কবে কালীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং কবে তাঁহার এই কালরূপ লীলার সমাপ্তি হইবে ইহাও কেহই বলিতে পারেন না। কালকে কেহই রোধ করিতে পারেন না। কালীর গর্ভে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড রহিয়াছে। বিশ্বের কারণ ও বিশ্ববীজাধার হইলেন এই কালী। এই কালীকে নিয়ন্ত্রণ করেন যে শক্তিমান তিনিই হইলেন "মহাকাল"। তাই সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন? কালীর মর্ম মহাকালই জানে, অন্য কেবা জানতে পারে তেমন!" —মহাবিদ্যার কালীতত্ত্বের সাধকের সিদ্ধিলাভে কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

দশমহাবিদ্যায় ঋষিশিল্পে দ্বিতীয় মহাবিদ্যা হইল "তারা"। অখণ্ড মহাসত্তা হইতে খণ্ড খণ্ড জ্যোতির্বিন্দুসম অণুপরমাণু সদৃশ চিদণু সৃষ্টির বক্ষে মহাকাশ মণ্ডলে অবিরত পতিত হইতে থাকে। সেই চিদণুরাজি মহা ইচ্ছার কারণে বিষ্ণুনাভিতে [কালচক্রে] পতিত হইয়া সৃষ্টিক্রমের চক্রমধ্যে তত্ত্বগতভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। সেই চিদণুরাজি সৃষ্টিমধ্যে জড় ও

চেতনরূপ অনন্ত পদার্থ সৃজনকারী। "তারা" দেবী হইলেন সেই খণ্ডকালশক্তি স্বরূপিনী বা শক্তি পরমাণু সদৃশ চিদণুরূপা, যাহা হইতে নিখিল রূপময় বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে পরবর্তী সৃষ্টিধারাগুলিতে। "তারা" দেবীর প্রাণময়রূপের বর্ণনা দিতে গিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি সাধক মহাতপচাঁদ [ইনি সাধক কমলাকান্তের সমসাময়িক] রচিলেন—

"এ শশী কে নীলবরণা, মুণ্ডমালা বিভূষণা।
শঙ্করের হৃদিস্থিতা প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণা ॥
চতুর্ভূজা রমণী একত্রে কৃপাণ পাণি
নীলোৎপল কপালে ধারিণী ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানা ॥
লম্বোদরী খর্ব্বকায়া লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা
পিঙ্গল জটাধরা ফণী শিরে ধরে ফণা।
নিবেদন ভবতারা "চন্দ্র" তত্ত্বজ্ঞান হারা
কৃপাকরি ও মা তারা ঘুচাও এ ভব যন্ত্রণা ॥"

অনন্ত আকাশের বুকে যেমন অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ রহিয়াছে

তারা

তেমনি অনন্তকালের বক্ষে অসংখ্য ব্যষ্টি জীব জগৎ রহিয়াছে। অনন্তের মধ্যে যে সান্ত বা বহু, তাহাই তারা মহাশক্তি। তারা অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেয়। তাই তারা মা দিগ্‌বসনা নহেন, দিগম্বরী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা খর্ব্বাকৃতি এবং শিববক্ষে প্রত্যালীঢ়া ও নৃত্যরতা। তাঁহার গতিও সৃষ্টির অভিমুখী। তারাদেবী জ্বলন্ত চিতার মধ্যে অবস্থান করেন। আত্মসত্তা ব্যষ্টিভাব ধারণ করিলেই মৃত্যুর অধীন হইয়া শ্মশানের অধীন হয়, তাই মা তারার অধিষ্ঠান জ্বলন্ত চিতার মধ্যে। তারাতত্ত্বে তারাদেবী ত্রিরূপে পূজিতা হন। নীলসরস্বতী, একজটা ও উগ্রতারা। মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার উপলব্ধিতে "তারাই হইলেন ব্রহ্ম, তারাই সমগ্র জগৎ। তারা নির্গুণা, সগুণা, নিরাকারা-সাকারা দ্বন্দ্বীভূতা, দ্বন্দ্বাতীতা; সর্বভাবময়ী সর্বাভাবতীতা। শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, কর্ম-অকর্ম সকলভাবেই তারা বিরাজমান।" জীবসত্তায় জীবত্বের জীববোধের খণ্ডচেতনাকে সাধক যে শক্তি প্রভাবে উপলব্ধি করেন, তিনিই হইলেন তারা শক্তি। সমষ্টি চেতনা হইতে যে শক্তি ব্যষ্টি চেতনাকে সত্তামধ্যে জাগাইয়া তোলে, তিনিই হইলেন তারা শক্তি। জীবত্বের উন্মেষ এবং জগতের উন্মেষ হয় এই 'তারা' শক্তির প্রভাবে। তাই তারা হইলেন—

"তারা তারা তারা তারা, অনন্তেরই বিন্দুধারা
নিরখিয়া যোগী হন আত্মহারা,
মহাশক্তির রূপ সত্যকারা ॥"

তারা বিদ্যার সাধক সিদ্ধিলাভে নিজ আত্মস্বরূপের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র জীবচেতনাকে উপলব্ধি করে জীবন্মুক্তি লাভ করেন।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বিদ্যাকে তন্ত্রে তৃতীয়া বিদ্যা ষোড়শী মহাবিদ্যা বা শ্রীবিদ্যা বলা হয়। তারারূপী চিদণুরাশি হইতে চিরন্তন ধ্রুব বিশ্বাকাশের জন্ম হয়। ইহার প্রকাশ শুধুমাত্র গতিহীন তেজ কণাত্মক অর্থাৎ রূপতত্ত্ব। এই রূপতত্ত্বই হইল "ষোড়শী"। সৃষ্টি নিত্য নূতনা। তাহা কেবল জড় শক্তির বিকাশ নহে, চিৎ ও জড়ের অপূর্ব সম্মিলন। তাই তৎকর্ত্রী চিন্ময়ী ষোড়শী রূপা। সৃষ্টি মধ্যে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকট বলিয়া ষোড়শী

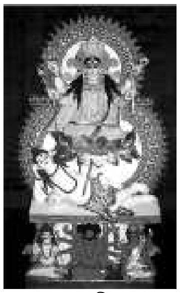
ষোড়শী

রাজরাজেশ্বরী। তিনিই সত্ত্বরজস্তমো গুণময়ী ত্রিপুরা বা ত্রিপুরেশ্বরী। ষোড়শী দেবী সদাশিবের নভোকমল হইতে উত্থিত হইয়া আবির্ভূত হন। দেবী ষোড়শী হইলেন—

"মহাবিদ্যা নিত্যাদা শিব আরাধ্য দেবীকা
ষোড়শ কলা সমাযুক্তা পূর্ণহন্তা কালিকা ॥
মহাপদ্মবনপুরে মহাবিন্দুসমা মাহেশ্বরী পদ্মাবতী,
কোটিচন্দ্র মণ্ডলাকার দিব্যাসনা জ্যোতি ভাতি।
শিব নাভিপদ্ম হতে সমুত্থিতা শ্রীদেবী ত্রিপুর হৈমবতী ॥
পরনাদ সমাদৃতা মহাশক্তি সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বন্দিতা দেবী মহা ভৈরবী যোগিনী ॥
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং মহাষোড়শী মহাবালা
ত্বং বিশ্বমাতা ত্বং বিধাতা মহাত্রিপুরেশ্বরী আদ্যামূলা
সগুণ-নির্গুণময়ী সর্বেশ্বরী যোগেশ্বরী মাতঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ বিশ্ববরেণ্য মাতঃ ॥"—

দেবী ষোড়শীই মায়া প্রপঞ্চের পোষণী মা অন্নপূর্ণা; সেই অন্নপূর্ণা কাশীপুরাধীশ্বরী। শিব যখন নির্গুণ তখন অন্নপূর্ণার ধার ধারেন না। কিন্তু শিব যখন সগুণ তখন কিন্তু তিনি অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। যেমন, আচার্য্য শংকর যতদিন যতি ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন ততদিন একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। যখন তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া কর্মক্ষেত্রে আসিলেন, তখন বিভূতি প্রদর্শন, দিগ্বিজয়, সম্প্রদায় গঠনাদি জন্য চিন্ময়ী প্রকৃতির আশ্রয় লইলেন। তখনই তিনি হইলেন শ্রীবিদ্যারূপা ত্রিপুরার উপাসক। তখনই তিনি কাশীক্ষেত্রে আসিয়া মা অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন, "হে অন্নপূর্ণে! হে সদাপূর্ণে! হে শঙ্কর প্রাণপ্রিয়ে! হে পার্বতী! জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দাও।"

মন, প্রাণ ও জ্ঞান—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিনটি লইয়াই ইচ্ছাশক্তির হয় প্রথম অভিব্যক্তি। কিন্তু এই মন, প্রাণ

ও জ্ঞান পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়া রূপায়িত হইতে পারে না। শিবব্রহ্মের ঈক্ষণরূপে নাভিপদ্ম হইতে যোড়শীর শক্তি সঞ্জাত। ঈক্ষণ বলিতে বুঝাইতেছে ইচ্ছাদিত্রয় অর্থাৎ ইচ্ছা-জ্ঞানা-ক্রিয়া বা পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী [বাক্] সমষ্টিবদ্ধভাবে আদিত্রয় সমষ্টিত্ব হইল সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। তাহা আরও রূপায়িত হইবার জন্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইল। তাই দেবী যোড়শীর বহনশক্তিরূপে আমরা দেখিতে পাই পঞ্চ দেবতাকে, যাঁরা হইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রুদ্র ও ইন্দ্র। এই পঞ্চদেবতা পরাশক্তিরূপা যোড়শীদেবীকে বহন করিয়া আনিল সগুণে। সেই পরাশক্তি যখন বীজভাবস্থিত বিশ্বকে স্ফূটীকরণের জন্য উন্মুখ হন, তখন সেই পরাশক্তিই বিশ্বকে বমনের জন্য "বামা" নাম প্রাপ্ত হন। সেই শক্তিই তখন "ইচ্ছা" শক্তিরূপে পশ্যন্তীতে অবস্থান করেন। সেইরূপ মধ্যমায় "জ্যেষ্ঠা" শক্তি হইল জ্ঞানশক্তি। আবার সেই শক্তিই সংহার দশায় বৈন্দবরূপ ধারণ করিয়া প্রাণশক্তিরূপে বৈখরীতে "রৌদ্রী" রূপে প্রকাশিত হন। যখন সেই পরমা কলারূপা বিমর্শশক্তি শ্রীমহাত্রিপুরাসুন্দরী যোড়শী দেবী আত্মার স্ফুরণ ঈক্ষণ করিতে চাহেন, তখন তিনি জগদ্ধাত্রী অম্বিকারূপ ধারণপূর্বক "পরা" নামে অভিহিতা হন। যোড়শী মহাবিদ্যা বা শ্রীবিদ্যায়সিদ্ধ সাধক ব্রহ্মাণ্ডে অতুল যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া মোক্ষলাভ করেন।

ঋষি শিল্পে চতুর্থ মহাবিদ্যা হইল "ভুবনেশ্বরী"। সৃষ্টিতত্ত্বে রূপতত্ত্ব যখন জমিয়া আকার প্রাপ্ত হইল, তখনই গঠিত হইল বিশ্বভুবন। ঐ আকার তত্ত্বই হইল ভুবনেশ্বরী। সৃষ্টি মধ্যে পরাশক্তি যখন নাম ও রূপে পরিণত হন তখন তাহাকে ভুবনেশ্বরী বলা হয়। সৃষ্টির জন্যে শিবব্রহ্ম আপন ইচ্ছাকে রূপদান করিতে গিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইল। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের নিমিত্ত উদ্ভব হইল পঞ্চতন্মাত্রা। ইহাই ভুবনেশ্বরী শক্তি।

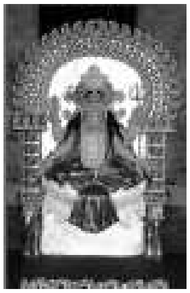
ভুবনেশ্বরী

অর্থাৎ, ভুবনেশ্বরী হইলেন এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অধীশ্বরী দেবী। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শময় সপ্তভুবনের যিনি ঈশ্বরী, অর্থাৎ ভুবন আকারে বা বিশ্ব আকারে স্থূলরূপে বাস্তব রূপে যাহা পরিণত হইবে তাহাই সূক্ষ্ম আকারে এই ভুবনেশ্বরীর মধ্যে রহিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"অয়ি ভুবন মনমোহিনী মা! ঐ নির্মল শুভ্রকরোজ্জ্বল ধরণী, জনক জননী ॥"—

শুধুমাত্র ধরণী কেন, সৃষ্টিতত্ত্বে সপ্তভুবনের সৃজন আছে। এই সপ্তভুবনই হইল সপ্তলোক এবং গায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতি। এই সপ্তভুবন পর্য্যন্ত প্রাণেরই প্রসার। এই সপ্তভুবনের নাম ও রূপ প্রদানকারী ঐশী শক্তির দেবীই হইলেন মা ভুবনেশ্বরী। সাধনার দ্বারা এই সপ্তস্থান হইতে প্রাণকে আহরণ করিয়া উর্দ্ধে উন্নয়ন করিয়া তথায় প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সাধকের ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। তখন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সাধক হৃদয়ে দর্শন করেন—উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় মা ভুবনেশ্বরীর অঙ্গকান্তি। কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে রত্ন মুকুট। ইনি ত্রিনেত্রা ও চতুর্হস্ত সমন্বিতা এবং ইহার বদনে নিত্য মধুর দিব্য হাসি রহিয়াছে। কবির ভাষায় মা হইলেন—

"ভুবনমোহিনী রূপে মাগো ভুবনেশ্বরী
দেখা দাও ঋষি ধ্যানে ভুবন সৃষ্টিকারী।
ভুবনেশ্বর সনে তুমি বিশ্ব সংসারী
কে বোঝে তোমার এই অদ্ভুত মহিমা!"

ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যায় সিদ্ধিলাভে সাধকের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় এবং সাধক ত্রিকালজ্ঞ হন।

বোধ বিকাশের পথে পঞ্চম মহাবিদ্যা হইল "ভৈরবী"। সৃষ্টি মধ্যে উর্দ্ধ এবং অধঃ গতিশীল জীবতত্ত্বই ভৈরবীমহাবিদ্যা। জীব একবার উপরের দিকে ওঠে অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতি ধাবিত হয় আবার নামিয়া পড়ে নীচের দিকে অর্থাৎ জড়ত্বের দিকে। ভৈরবী দেবীরূপে জটাজুট সমন্বিতা; জীবের উর্দ্ধগতির প্রতীক হইল দেবীর মস্তকের জটা স্বরূপ। উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় দেবীর দেহকান্তি। পরিধানে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বসন, গলদেশে মুণ্ডমালা। হস্তে জপমালা, বর, অভয় ও পুস্তক। ভৈরবী দেবীর কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, নয়নে রক্তারবিন্দ শোভিত, মস্তকে রত্নময় মুকুট ও বদনে মধুর হাসি।

ভৈরবী

ভৈরবীদেবী হইলেন শিবব্রহ্মের রাগরূপা অনুরাগ। শাস্ত্রীয় ঋষির বর্ণনায় ভৈরবী রূপ হইল — "স্ফটিক রচিত পীঠে রম্য কৈলাসশৃঙ্গে বিকচ কমল পত্রৈরর্চ্চয়ন্তী মহেশম্। করতল ধৃত বীণা পীতবর্ণায়তাক্ষী সকভিরিয় মুক্তা ভৈরবী ভৈরব স্ত্রী।" প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের ভরণ হেতু অর্থাৎ স্থিতি হেতু, রক্ষণ হেতু অর্থাৎ পরচিন্মাত্রপর্য্যবসান লক্ষণরূপ সংহার হেতু এবং বমন হেতু অর্থাৎ সৃষ্টি হেতু তিনি ভৈরবী আখ্যাধারিণী। লক্ষণীয় ভরণ-রক্ষণ-বমন এই তিন শব্দের আদ্যাক্ষর লইয়া ঈশ্বরী স্বরূপা "ভৈরবী" শব্দ গঠিত হইয়াছে। "ভৈরবী" মহাবিদ্যায় সিদ্ধ সাধক পরমশিবাবস্থা লাভ করেন।

দশমহাবিদ্যায় ষষ্ঠ মহাবিদ্যা হইল "ছিন্নমস্তা"। ছিন্নমস্তা

মহাবিদ্যা হইল যোগমার্গ। ইহা বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা বিদ্যারূপী। যতক্ষণ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের গতি বহির্মুখীনভাবে থাকে অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রাণের গতি যখন বাহিরের অভিমুখে থাকে, ততক্ষণ মনের গতিও বহির্মুখীন থাকে। তাই সে অবস্থায় বাহ্য জগতের বিষয় সকলই একমাত্র সত্য বলিয়া মানুষ কল্পনা করিয়া লয়। অন্তরঙ্গাভাবে যৌগিক কৌশল অবলম্বনপূর্বক সাধক যখন শ্বাসের গতিকে অন্তর্মুখীন করিয়া স্বশক্তি দ্বারা মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া আত্মস্থ হইয়া পরাবস্থায় সত্ত্বময় পরিব্যাপ্ত আত্মবোধের উপলব্ধি করেন, তখন সাধকের মনের কামনা-বাসনারূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া সাধক হৃদয়ে প্রকাশিত হয় প্রেমবুদ্ধ অনাসক্তি। অন্তঃস্থিত ইড়া ও পিঙ্গলায় প্রাণের গতি রহিলেও কামনা-বাসনারূপ অগ্নি সাধক-অন্তরে প্রজ্জ্বলিত থাকে। কিন্তু যখন প্রাণের গতি সুষুম্নাগামী হইয়া সাধক হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়, তখন সাধক আত্মবোধের উপলব্ধি করিতে পারেন। ছিন্নমস্তা দেবীরূপের মধ্যে ত্রিদেবীকে ত্রিধারায় রক্তপান করিতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপী প্রাণের গতি বা জৈবী শক্তির বহির্গতি ও অন্তর্গতিকে বুঝানো হইয়াছে। দেবীপদতলে কামনার মূর্ত ছবিরূপে কাম ও রতিকে মর্দ্দিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষ অসংখ্য কামনা-বাসনার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ছিন্নমস্তা শক্তি অন্তরে জাগ্রতা হইলে এই কামনা-বাসনার শৃঙ্খল হইতে সাধক মুক্ত হইয়া যান। ছিন্নমস্তা বিদ্যায় সিদ্ধ সাধকের প্রজ্ঞালোকে আত্মদর্শন ও আত্মবোধ লাভ হয়ে তিনি হন যোগসিদ্ধ।

ছিন্নমস্তা

ঋষি শিল্পে বোধ বিকাশের পথে সপ্তম মহাবিদ্যা হইল ''ধূমাবতী''। মানব যখন চরম আত্মবিস্মৃত অবস্থায় রহে এবং সেই চরম আত্মবিস্মৃতির ফলে অজ্ঞান, হাহাকার, দুঃখদৈন্য প্রভৃতির জন্য দুর্দশাগ্রস্থ জীবরূপে মহাশক্তি যখন লীলা করেন তখনই তিনি হন ধূমাবতী। ধূমাবতী দেবী বিবর্ণা, চঞ্চলা, রুষ্টা ও দীর্ঘাঙ্গী। দেবীর পরিধেয় বসন অতি মলিন, কেশ বিবর্ণা ও অতিরুক্ষ। ইনি বিধবা। তিনি নিজ অস্তিত্বস্বরূপ শিবসত্তাকেও বিস্মৃত হইয়া ধ্বংসের লীলায় মত্ত হন। তাই তিনি ভয়ংকরী ও ভীষণা। কাকধ্বজ রথে ইনি আরূঢ়া অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে জীবের দেহই হইল কাকধ্বজ রথস্বরূপ। দেবী জরাজীর্ণা, স্খলিতদন্তা, পলিত কেশা, গলিতস্তনী ও অতিবৃদ্ধা। জরতী বলিয়াই তো মা হন রিপুহরা মহাশক্তি। সাধক হৃদয়ে ধূমাবতী শক্তি জাগ্রত হইলে পরে সাধকের অন্তরের সকল অবিদ্যা নাশ হইয়া সাধক হন পরমহংসব্রতধারী।

ধূমাবতী

ঋষিশিল্পে অষ্টম মহাবিদ্যা তত্ত্ব হইল ''বগলা''। সাধক হৃদয়ে অপরাভাব বিগলিত হইলে পরে বোধ বিকাশের পথে হৃদয়ে গুরুশক্তি পূর্ণরূপে জাগ্রত হন। মানবের মনমধ্যে উদ্বুদ্ধ গুরুরূপী আত্মশক্তিই ''বগলা'' দেবী স্বরূপা। জগতের হিতকল্পে মা বগলা যাহাকে করিয়া যান আদর্শ—নিত্যসন্মার্গের অনুবর্তনকারী, স্বধর্মের যাজক, তাঁহার গতিপথে কোন বাধা থাকে না, আপন পথে আনন্দ মনে তখন তিনি অনন্ত চেতনার ধারার পানে অগ্রসর হইয়া যান। ত্রিতাপ তপ্ত সাধক হৃদয়ে তখন নামিয়া আসে শান্তি প্রদায়িনী মন্দাকিনী ধারা; সেই অমৃত ধারায় বিধৌত করে সাধক জীবনের যত অবিদ্যা মল—দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি আসুরী বৃত্তি নিচয়। মা হন প্রসাদমুখী। অয়ি বগলামুখি! সুধাসমুদ্রের মধ্যে নির্মিত মণ্ডলে রত্নবেদীতে ইনি অবস্থান করেন। ইনি পীতবর্ণা অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যশক্তি স্বরূপা। দেবী পীত বসনে, পীতভূষণে ও পীত মাল্যে সুশোভিতা দুর্গতিনাশিনী দেবীদুর্গারূপিনী। দেবীর এক হস্তে মুদ্গর, যাহা বিবেকজ্ঞানজ বৈরাগ্যের প্রতীকস্বরূপ এবং অন্য হস্তে শত্রু জিহ্বা অর্থাৎ সাধকের বাক্‌রহিত অবস্থার প্রতীক স্বরূপ। এই দেবীই হইলেন মা বগলা। ''বগলা'' মহাবিদ্যায় সিদ্ধ সাধকের ব্রহ্মপদ লাভ হয়। এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে সাধক আপনাতে আপনি থাকিতে সক্ষম হন ও তাহার আত্মতুষ্টি হয়। তাই শ্রীশ্রীপরমহংসদেব গাহিতেন, ''আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে''।

বগলা

প্রকৃতিতত্ত্বে বোধ বিকাশের নবম মহাবিদ্যা হইল ''মাতঙ্গী''। সূক্ষ্ম অন্তরজগৎ জুড়িয়া সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মময়ের দিব্য স্পর্শলাভের ফলে সাধক হৃদয়ে এক অচিন্ত্যনীয় অনির্ব্বচনীয় পুলক অনুভূত হয়। চিৎস্বরূপিণী মহাশক্তি যখন সাধকের অন্তর মাঝে আনন্দ চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি হইলেন মাতঙ্গী। সাধক কবির ভাষায়, ''আমায় মাতিয়ে দে আনন্দময়ী, এমনি করে মাতিয়ে দে গো, যেমন মেতেছিলেন রাই।'' —রূপানুগা আত্মশক্তির অবলোকনেই ঘটে সাধকের ভোগের মধ্যে মহাযোগ। মহামিলনেই হয় চরম ও পরম মঙ্গল—ত্রিতাপহারী বাস্তব শিবজ্ঞান। আনন্দস্বরূপা দেবী

মাতঙ্গী শ্যামাঙ্গী, অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী ও ত্রিনয়না। দেবীর হস্তচতুষ্টয়ে মায়ারূপী পাশ, কালদণ্ডরূপী অঙ্কুশ, পরমজ্ঞানরূপ খড়্গ এবং বৈরাগ্যের প্রতীক স্বরূপ খেটক রহিয়াছে। রত্ন সিংহাসনে ইনি বিরাজিতা। আনন্দস্বরূপা দেবী ভগবতী হইলেন মতঙ্গের অর্ধাঙ্গিনী মাতঙ্গী। ইনি শারদ সুধাকর উজ্জ্বল জ্যোতি সম্পন্না। সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের ভাষায়—

মাতঙ্গী

"অয়ি শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর মণ্ডল বদনী রে।"

আনন্দস্বরূপা শিবপ্রিয়া মহাশক্তি মায়ের বর্ণনা দিতে গিয়া কবিরঞ্জন আরও বলিয়াছেন—"ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মা'র, চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী। যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা, আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী।" শ্যামাই শ্যামরূপ ধারণ করেন। সচ্চিদানন্দের প্লাবনে ঠিক এমনই ব্রহ্মভাবময় আনন্দপূর্ণ চৈতন্যধারা সাধক হৃদয়কে ভরপুর করিয়া রাখে। তখন সাধক যেন একটি ভরা ঘট, শিবোহম্। "মাতঙ্গী" বিদ্যায় সিদ্ধসাধকের আত্মউপলব্ধি হইয়া তিনি হন নিত্যসিদ্ধ পূর্ণযোগী।

ঋষিশিল্পে বোধ বিকাশের দশম্ ও সর্বশেষ মহাবিদ্যা রূপিনী হইলেন "কমলা"। নির্গুণ পরাৎপর ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মহামিলনের দ্বারা যখন উভয়ের ভেদাভেদ সংস্কার তিরোহিত হইয়া আত্মাতে অদ্বৈত সম্বেদনশ্রী ফুটিয়া ওঠে তখন সেই শ্রীই হইল "কমলা" তত্ত্ব। কমলে কমলে, প্রতিজীবরূপ কমলে মা কমলা আত্মশক্তিরূপে করিতেছেন নিত্যলীলায় আনন্দ বিহার মূর্ত ও অমূর্তরূপে। এই কমলারূপা দিব্য ঐশ্বর্য্যশালিনী পরাশক্তিস্বরূপিনী বিমলা হইলেন মহালক্ষ্মীরূপা পদ্মজা কমলা, মহাসরস্বতী ও মহাকালীস্বরূপা

কমলা

আদ্যাশক্তি মহামায়ার শান্তারূপসদৃশ "শ্রীরাধা" জগদ্ধাত্রী। কমলাদেবীর অঙ্গকান্তি দিব্য স্বর্ণাভ জ্যোতি সমুজ্জ্বল। হিমাদ্রিসদৃশ চারিটি হস্তী শুণ্ড দ্বারা অমৃতপূর্ণ সোনার কলস গ্রহণ করিয়া দেবীর অভিষেক করে। শ্বেতহস্তী প্রণবের প্রতীক, আর স্বর্ণময় কলস অতুল দিব্য ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। দেবীর দুই হস্তে বর ও অভয়, অন্য দুই হস্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ পদ্মফুল রহিয়াছে। দেবীর মস্তকে মুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং আসনে পদ্ম রহিয়াছে। ইনি হরিশ বিলাসিনী। দেবী কমলে কামিনী শিবের পরমসিদ্ধিদাত্রী। তাই মা কমলাকে বন্দনা করিতেছি—

"মাগো, প্রণবজ্যোতির আলোকেতে
ধৌত যে হয় তব কায়া,
আদ্যা নিত্যা তুই যে গো মা
বিরাট বিশ্বে হলি মায়া ॥
তোর প্রকাশে মানসপটে
হৃদয় কমল আপনি ফোটে
দেখি তোর জ্যোতির কণা
রয়েছে তো সর্বঘটে ॥
তুই যে প্রণব প্রণবজ্যোতি
যোগমায়া রূপে নিত্যে স্থিতি
তোর অনিত্য এই জগৎ মাঝে
শাশ্বত রূপ শিবের সতী ॥
পরমব্রহ্মশক্তি হয়ে মা, রইলি অটল বোধোদয়ে,
ভাব অভাবের খেলায় মেতে
রইবি মহামায়া হয়ে ॥—
বন্দে মাতা কমলা বিমলা হরিশ বিলাসিনী
প্রণমামি ত্বং দেবী মহাবিদ্যা স্বরূপিণী ॥"

সৃষ্টিতত্ত্বে আদ্যাশক্তি মহামায়া দশমহাবিদ্যা রূপে সুপ্রতিষ্ঠিতা। সেই আদি-অনন্ত অখণ্ড শক্তির খণ্ড খণ্ড অংশ সম্ভূতা ধারাই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য। এই অখিল বিশ্বসংসার খেলা মহাকামকলা মধু সংকল্পে সৃষ্ট। ইহা অখণ্ড মায়েরই মধু। সুতরাং মায়ের মধু খেলা এই বিশ্বলীলায় সু বা কু বলিয়া বোধ বিকাশের এই চরমভূমিতে কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। সাধক এই স্তরে আসিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান।

—হরি ওঁ তৎ সৎ—

"দুর্গা সম পূজা নাই, দুর্গা সম ধন নাই।
দুর্গা সম জ্ঞান নাই, দুর্গা সম ফল নাই।
দুর্গাকে ভজনা কর, দুর্গাকে স্মরণ কর,
দুর্গাকে যজন কর। তৎক্ষণাৎ ভব বন্ধন
হতে মুক্ত হবে।" —মুণ্ডমালা তন্ত্র

ত্বং সর্বরূপিণী দেবী সর্বেষাং জননীপরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি, সর্বেষাং তোষণংভবেৎ ॥
—মহানির্বাণতন্ত্র